প্রথম অধ্যায় ঃ

প্রমথনাথ বিশীর সাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপট হিসেবে তাঁর জীবনের মুখ্য ঘটনাপুঞ্জ, তাঁর বিশিষ্ট লেখক স্বভাবের ও সাহিত্য সৃষ্টির পারিপার্শ্বিকতার সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

প্রথম অধ্যায়

প্রমথনাথ বিশীর সাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপট হিসাবে তাঁর জীবনের মুখ্যঘটনাপুঞ্জ, তাঁর বিশিষ্ট লেখক স্বভাবের ও সাহিত্য সৃষ্টির পারিপার্শ্বিকতার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

প্রমথনাথ বিশী বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র ধারার শিল্পী। শিল্পী প্রমথনাথের স্বতন্ত্র শিল্পকুশলতার পরিচয় ফুটে উঠেছে গদ্যে, পদ্যে, উপন্যাসে, গল্পে,প্রবন্ধে ও নাটকে। এই সর্বতোমুখী সাহিত্য প্রতিভা প্রমথনাথকে করে তুলেছে বিশিষ্ট। নানাবিভাগের স্বচ্ছন্দ পদচারণায় প্রমথীয় সাহিত্য যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি স্বনামে, বেনামে, সংক্ষিপ্তনামে তিনি বহুরূপী ও বিস্ময়কর সব্যসাচী।

প্রমথনাথের শিল্পপ্রতিভার মূল্যায়ন করতে গিয়ে ডঃ ভূদেব চৌধুরী বলেছেন ঃ

" শিল্পীমনীষী প্রমথনাথ বিশী একদিকে দেশ - কাল - সাহিত্য - সংস্কৃতি সমাজ সম্পর্কে তাঁর খরশান চিদ্ ভাবনাগুলিকে সহৃদয় চিত্তবৃত্তির জারক রসে জারিত করে স্নিগ্ধ রসান্বিত উপন্যাস, কবিতা অথবা সাহিত্য প্রবন্ধ রচনায় ছিলেন অবিরলগতি; আর একদিকে হৃদয়ানুভবের সকল কোমলতাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের তাপে বাষ্পীভূত করে জীবনের যত দুর্বলতা, স্খলন, পতন, দৈন্যের পটভূমিতে বসেছিলেন খরবুদ্ধি প্র.না.বি.র তীক্ষ্ম পরিহাস রসের খড়্গ হাতে করে। দেখে বিস্ময়ের সঙ্গে মনে হয়, একই ব্যক্তিত্বের আধারে এই পরস্পর বিরোধী দ্বৈত অস্তিত্ব কি করে সম্ভব! কিন্তু বাইরে যা দ্বৈতস্বভাব, শিল্পীর অন্তরে আসলে

তাই দ্বৈতা দ্বৈত- বিপরীতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারার সানন্দ চমক রচনাতেই প্রমথনাথ বিশীর প্রতিভা যেন এক আশ্চর্য কৌতুক অনুভব করত।"[১]

বাংলাসাহিত্যের এই বিস্ময়কর সব্যসাচী আবির্ভূত হলেন এমনকি একটি যুগসন্ধিকালে যখন ঊনবিংশ শতাব্দীর সূর্য অস্তমিত, দ্বারপ্রান্তে উদীয়মান বিংশ শতাব্দীর সূর্যশিখা। এমনি একটি যুগসন্ধিলগ্নে যখন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রভাব অস্তমিত হয়ে যায় নি আবার বিংশ শতাব্দীর যুগজীবনের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিষ্ঠুর শোষণ জাতীয় জীবনকে করেছিল বিধ্বস্ত, লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উদ্ভূত জমিদার শ্রেণীর সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছিল সেখানে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার অভিঘাতআছড়ে পড়েছিল, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রভূমি তৈরী হচ্ছিল, তারই ফলশ্রুতি হিসেবে অবিশ্বাস, হতাশা, যন্ত্রণায় যুগজীবনে সংশয় ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল, খর্ব হয়েছিল মনুষ্যত্বের মর্যাদা, পুরাতন মূল্যবোধ ও বিশ্বাস হারিয়ে যাচ্ছিল এমনি একটি লগ্নে আবির্ভূত হলেন এক বিশিষ্ট শিল্পী প্রমথনাথ বিশী রাজসাহী জেলার নাটোর মহকুমার অন্তর্গত জোয়াড়ি গ্রামে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুন, বঙ্গাব্দ ২৮ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮। পিতার নাম নলিনীনাথ বিশী, মাতা সরোজবাসিনী দেবী।

প্রত্যেক শিল্পীর সাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যক্তিজীবনের মুখ্য ঘটনাপুঞ্জ লেখক স্বভাব ও সাহিত্যসৃষ্টির পারিপার্শ্বিক পরিমন্ডল লেখকের মনোজগতে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রাখে। মূলতঃ একজন শিল্পীর সাহিত্য সৃষ্টি তাঁর চিত্তবৃত্তির প্রতিফলন। একারণে কোন সাহিত্যিকের শিল্পকর্ম উপলব্ধি করতে হলে মনোজগৎই হল সবচেয়ে বড় পথনির্দেশিকা। যুগচেতনা, পারিপার্শ্বিক পরিমন্ডল ও জীবনের ঘটনাপ্রবাহের গতিশীলতার

স্রোতে শিল্পমনে প্রত্যক্ষ দর্শন, ভাবনাচিন্তা ও কল্পনাশক্তির দ্বারা নিজ জীবনদর্শন গড়ে তোলে। শিল্পী যা দেখে যা ভাবে সেটাই বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে শিল্পরূপ ফুটে উঠে। লেখকস্বভাব গড়ে ওঠে প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ঃ

এক।। যুগধর্ম।

দুই।। পরিবেশ।

তিন।। লেখকের বংশানুক্রমিক চিত্তবৃত্তি।

এই তিনটি বিষয়ের মধ্য দিয়েই লেখকের চেতন, অচেতন ও অবচেতন মনের উদ্ভব ঘটে।

বলাবাহুল্য এই তিনটি প্রভাবকে কোন শিল্পীই উপেক্ষা করতে পারেন নি। মুকুন্দরাম থেকে শুরু করে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দীনবন্ধু, সুকান্ত, তারাশঙ্কর; মানিক, বিভূতিভূষণ, ম্যাক্সিম গোর্কী, মোঁপাসা, শেকস্‌পীয়ার, দান্তে, মিল্টন প্রত্যেকের ব্যক্তিজীবনকে উপেক্ষা করে সাহিত্যজীবন গড়ে উঠে নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কবি জীবনী' প্রবন্ধে মহাকবি দান্তের উদাহরণ টেনে বলেছেন " দান্তের কাব্যে দান্তের জীবন জড়িত হইয়াছে। উভয়কে একত্রে পাঠ করিলে জীবন ও কাব্যের মর্যাদা বেশি করিয়া দেখা যায়।"[২]

কথাশিল্পী প্রমথনাথ বিশীর সাহিত্য প্রতিভার আলোচনা করতে গেলে একই সঙ্গে শিল্পী ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিজীবন আলোচনার অপেক্ষা রাখে। কেননা ব্যক্তি প্রমথনাথ বিশীকে না জানলে শিল্পী প্রমথনাথ বিশীর টেকনিক বা শিল্পরূপের সঠিক মূল্যায়ন অপূর্ণ থেকে যায়। এজন্য সাহিত্য প্রসঙ্গকে ' জীবনের বিশদ ব্যাখ্যা না বলে কবি জীবনের বিশদ ব্যাখ্যা বলাটাই সঙ্গত '। কাজেই লেখকের ব্যক্তিত্বের একটা বড় দিক উজ্জ্বল পাদপ্রদীপে চিরভাস্বর হয়ে

ওঠে।

প্রথম অধ্যায়ে আমাদের মূল আলোচ্য প্রমথনাথ বিশীর সাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপট হিসেবে যুগধর্ম, ব্যক্তি জীবনের ঘটনাপ্রবাহ, সাহিত্যসৃষ্টির পারিপার্শ্বিকতা বিশিষ্ট লেখক স্বভাবের স্বরূপ নির্ণয়। এক বিচিত্র পরিবেশের বহুবিচিত্র লীলা রহস্য উদ্‌ঘাটনের মধ্য দিয়ে শিল্পী প্রমথনাথের সাহিত্যের বীজ কিভাবে অঙ্কুরিত হয়েছিল সেই সঙ্গে সাধারণ জীবনের ঊর্ধ্বে সৃজনশীল জীবন কিভাবে উত্তরোত্তর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল অনুসন্ধানী মন নিয়ে তার সঠিক তথ্য ভিত্তিক বিবরণ।

'বিচিত্রসংলাপ' গ্রন্থের উৎসর্গ করতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশী সাহিত্যরসিক প্রবোধ চন্দ্র ঘোষকে ব্যক্তি জীবনের মুকুরে এক জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেয়ে লিখেছেন ঃ

"সংসারের বিষবৃক্ষে
দুটি ফল মধুময়
কাব্যামৃত স্বাদ আর
সজ্জনের পরিচয়।"

এই কয়েকছত্রে লেখকের মনোভূমি কিভাবে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে তা আমাদের বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। আবার কবি যখন ' দেয়ালি' কাব্যগ্রন্থে সৃষ্টির আনন্দে কিভাবে সত্য ও সুন্দর চেতনার জন্ম হয়েছে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন —

" এ ধরণী খানি সেই ধরণীর
ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুধু,
সব জগতের ফুল হতে তোলা
সকলের সেরা মধু।"[৩]

সত্য শিব ও সুন্দরের পূজারী ছিলেন প্রমথনাথ বিশী - সত্য শিব ও সুন্দরের দেশেই তাঁর জন্ম। যা সুন্দর তাই সত্য ও কল্যাণময় — এই বিশ্বাস তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। যা মানুষের অকল্যাণ ডেকে আনে তা সত্যও নয় সুন্দরও নয় - এ বিশ্বাস তাঁর ছিল বলেই তিনি কলাকৈবল্যবাদের বিশ্বাসী।

প্র.না.বি. সাহিত্যিক ছদ্মনাম। আসল নাম প্রথমনাথ বিশী। প্রমথনাথের সাহিত্যিক খ্যাতি সাহিত্য রস পিপাসুর কাছে প্র.না.বি নামে শুধু নয় এছাড়া আর একাধিক ছদ্মনামের সঙ্গে আমরা বিশেষভাবে পরিচিত। 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রমথনাথ বিশী নামে, 'শনিবারের চিঠি'তে বিষ্ণুশর্মা ছদ্মনামে, কল্লোলের কটাক্ষ করেছেন স্কট টম্‌সন্ নামে, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ যুক্ত সাংবাদিক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে কমলাকান্ত শর্মা ছদ্মনামে। এছাড়া হাঁতুড়ী, অমিত রায়, মাধব্য ছদ্মনামেও লিখেছেন প্রমথনাথ। বলাবাহুল্য জর্জ বার্নার্ড শর ছদ্মনামে জি. বি. এস. এর নামের অনুকরণে প্র.না.বি. ছদ্মনামটি বেছে নিয়েছিলেন প্রমথনাথ বিশী।

প্রমথনাথের সাহিত্য সৃস্টির প্রেক্ষাপটকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারেঃ

এক।। শান্তিনিকেতন পর্ব।

দুই।। রাজসাহী পর্ব।

তিন।। কলকাতা পর্ব।

প্রমথনাথ বিশীর পিতা নলিনীনাথ বিশী ছিলেন রাজসাহী জেলার নাটোর মহকুমার অন্তর্গত জোয়াড়ী গ্রামের সম্ভ্রান্ত জমিদার। অর্থাৎ জন্মসূত্রে প্রমথনাথ ছিলেন এক বনেদী জমিদার পুত্র। শিরায় উপশিরায় জমিদারী রক্ত বহন করে প্রমথনাথের ব্যক্তিজীবনে গড়ে উঠেছিল জমিদারী আভিজাত্য বোধ। সন্তানবৎসল পিতার অপত্যস্নেহ শিক্ষা, অনুরাগ, স্বদেশ

চেতনা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। উদারহৃদয়, স্বজনবৎসল, কর্তব্যপরায়ণতা, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা তিনি তাঁর পিতৃ নলিনীনাথের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। পিতা নলিনীনাথ ও মাতা সরোজবাসিনীর তিনি দ্বিতীয় সন্তান এবং প্রথম পুত্র। জোয়াড়ী ও তার আশে পাশের রাজসাহী, নাটোর, বড়াইগ্রাম, চলনবিল, সিরাজগঞ্জ, ফরিদপুর, পাবনা, কুষ্ঠিয়ার মাটি ও মানুষেরা তাঁর মনে রেখাপাত করেছিল। প্রমথনাথ উত্তরবঙ্গের পল্লীপ্রকৃতিকে একান্তভাবে ভালোবেসেছেন সেই গ্রামকে কেন্দ্র করে আশেপাশে বিস্তীর্ণ এলাকার সমাজজীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং সেই অভিজ্ঞতার বহুবিচিত্র লীলারহস্য শিল্পীর নিপুন তুলিতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে এবং অনন্য ভাবপ্রবাহ ও মেজাজের সৃষ্টি করেছে সন্দেহ নেই। আপন অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমথনাথ দেখেছেন জমিদারে জমিদারে লড়াই, দেখেছেন জমিদারী আভিজাত্য, জমিদারদের দুর্গোৎসব, যাত্রাপালা, নারকেল কাড়াকাড়ি খেলা, বাহ্যিক আড়ম্বর পূর্ণ উচ্চবিত্ত এই শ্রেণীর জীবনধারা। প্রভাব প্রতিপত্তি, আত্ম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কি করুণ পরিণতি। দেখেছেন সমাজ জীবনের বিবর্তিত রূপ যেখানে বংশগৌরবের ঘটেছিল অনিবার্য পরাজয়, কোম্পানীর শাসনের ফলে জমিদারী বাজেয়াপ্ত - সে এক বিষাদকরুণ প্রতিচ্ছবি। জমিদার বংশের সন্তান হয়ে প্রমথনাথের ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাসবোধ গড়ে উঠেছিল।

প্রমথনাথের স্বদেশ চেতনা জাগ্রত হয়েছিল উত্তরাধিকার সূত্রে। পিতা নলিনীনাথ বনেদী জমিদার হয়েও দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মুক্ত করবার জন্য বৃটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেগিয়ে ১৯৩০ ও ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে মোট তিন বার কারারুদ্ধ থেকেছিলেন। প্রমথনাথের ব্যক্তিজীবনে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব ছিল ব্যাপক তাঁর

সাহিত্যে এর প্রতিফলন ঘটেছে।

নলিনীনাথ ছিলেন সাহিত্য ও শিল্পানুরাগী ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তি। ব্যক্তিজীবনে পিতৃস্বভাবগুণ তিনি আত্মস্থ করেছিলেন।

মাতা সরোজবাসিনী দেবী ছিলেন আদর্শপরায়ণা নারী চরিত্র। মাতৃ স্নেহধন্য প্রমথনাথ বিশীর মনোভূমিতে ন্যায়নিষ্ঠা, শালীনতা, সত্যবাদিতা ও রুচিশীলতা বোধ জাগ্রত হয়েছিল মাতৃ প্রভাবেই। 'রামায়ণ' 'মহাভারত' গ্রন্থের প্রতি একান্ত অনুরাগ ছিল প্রমথনাথের মাতৃপ্রভাবজাত। এজন্যই প্রমথনাথের কথাসাহিত্যে পৌরাণিক প্রভাব দুর্লভ ছিল না।

শান্তিনিকেতন পর্ব

পিতার উজ্জ্বল প্রেরণাতেই মাত্র নয় নয় বছর বয়সে ১৯১০ এর আষাঢ়ের এক সন্ধ্যায় বালক প্রমথনাথ ও তাঁর ছোট ভাই শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে লেখাপড়া শেখার উদ্দেশ্য নিয়ে বীরভূমের মাটিতে প্রথম পদার্পণ করেন। প্রমথনাথের শিক্ষাকেন্দ্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর পিতার স্বদেশানুরাগ ও ইংরেজ সরকার বিদ্বেষী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। নলিনীনাথ বিশী প্রথমে প্রমথনাথকে হরিদ্বারের গুরুকুল আশ্রমে পাঠাবার জন্য উদ্যোগ নিচ্ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে রাজসাহীর বরেণ্য উকিল অক্ষয়কুমার মৈত্রের সুপরামর্শে রবিঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি করবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে কৈশোর কালে ছাত্র হিসেবে ভর্তি হবার সুবাদে অভিভাবক, শিক্ষক ও প্রেরণাদাতারূপে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রস্নেহধন্য প্রমথনাথ বিশী ছিলেন আজীবন

রবীন্দ্রভক্ত। রবীন্দ্রস্নেহ সংবর্ধিত প্রমথনাথ স্বল্প বয়স থেকেই সৃজনদক্ষ হয়ে উঠেছিলেন।

শান্তিনিকেতনের 'বীথিকা' গৃহেই জীবনের সতেরোটি বসন্ত কাটিয়েছেন তিনি। এই সতেরো বছর সময়কালই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির উন্মেষপর্ব হিসেবে চিহ্নিত। শান্তিনিকেতনে এক সময় ছাতিম গাছের ছায়ায় একটি নির্মল সত্য ও আনন্দরূপ বিরাজ করত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বোলপুর প্রান্তরে একতলা গৃহটির নাম দেন 'শান্তিনিকেতন' —

" সেদিন ছাতিমতলাটি ছিল তাঁর হৃদয়ের গভীর উপলব্ধির স্থল, এখানকার সমস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশটির কটি মাত্র বাস্তব সংজ্ঞা ছিল ঐ 'শান্তিনিকেতন'। গৃহটির নামের থেকেই জায়গাটির নামকরণ হয়। ছাতিম তলায় খোদাই করা ছিল " তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।" আর শান্তিনিকেতনের গৃহটির মাথায় লিখিত হয়েছিল - " সত্যাত্ম প্রাণারামং মন আনন্দং।"[৪]

শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক পরিবেশ থেকে প্রমথনাথ সান্নিধ্য পেয়েছিলেন উদার ব্যক্তিত্বের - যা তাঁর সাহিত্যরচনার পরিমন্ডল সৃষ্টির সহায়ক হয়েছিল। প্রমথনাথ তাঁর স্মৃতিমূলক গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' এবং ' পুরানো সেই দিনের কথা' গ্রন্থে শান্তিনিকেতনের স্মৃতিসূত্র কাব্যব্যঞ্জনাময় প্রাঞ্জল ভাষায়, কৌতুকপ্রবণ মন নিয়ে লেখা অনবদ্য সংযোজন। আলোচ্য গ্রন্থে আমরা চিনে নিতে পারি প্রমথনাথের জীবনের সতেরো বছরের ঘটনাপুঞ্জ ও লেখকস্বভাবকে।

"বড় লেখকের সাহচর্যে বাস করলেই লেখক হওয়া যায় না, শান্তিনিকেতন থেকে বেরিয়েছে কুল্লে একটি সাহিত্যিক বিশীদা "। একদা বলেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী। তিনি আরও বলেছেন " প্রমথনাথ জাত সাহিত্যিক।[৫]

প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে কবিতীর্থ শান্তিনিকেতনের সম্পর্ক ছিল একান্ত ঘনিষ্ঠ। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রমথনাথ ছিলেন স্বল্পসংখ্যক ছাত্রদের মধ্যে একজন। তারপর প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে গুরুদেবের আদর্শে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রমথনাথ সে সময় শান্তিনিকেতনে দেখেছেন কাব্যচর্চা ও সাঙ্গীতিক পরিবেশ। গুরুদেবকে ঘিরে জ্ঞানী গুণী রসজ্ঞমন্ডলের উপস্থিতিতে এক রত্নসভা গড়ে উঠেছিল। এই রত্নসভা যাঁরা অলঙ্কৃত করেছেন তাঁদের প্রভাব প্রমথনাথ বিশীর মনোজগতে গভীরতা দান করেছিল।

ছাত্রাবস্থায় প্রমথনাথ গণিত শিক্ষক শরৎবাবু ও নগেন আইচের কঠোর অনুশাসনের মধ্যেও গণিতে দুর্বল এই ছাত্রটি অঙ্কখাতায় একটি কবিতা লিখেছিলেন —

" হে হরি হে দয়াময়
কিছু মার্ক দিও আমায়।
তোমার শরণাগত
নহি সতত
শুধু এই পরীক্ষার সময়।"

প্রমথনাথের লেখা প্রথম কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের হাতে ঘটনাক্রমে এসে পৌঁছেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কবিতা লিখতে উৎসাহিত করেছেন। শান্তিনিকেতনের দেহলিভবনে রবীন্দ্রসান্নিধ্যে শব্দের সঙ্গে শব্দের মিল করবার কৌশল শিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কবিতার একটি ছত্র লিখে দিতেন প্রমথনাথকে পরের লাইনটি লিখে দিতে হত। এভাবেই তাঁর কবিতা রচনার শুরু হয়েছিল।

শিক্ষাজীবনের প্রারম্ভে উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর 'ছেলেদের মহাভারত' ছাড়াও রামায়ণ ও রবীন্দ্রকাব্যের শিক্ষালাভ করেছিলেন তেজেশবাবুর সান্নিধ্যে। জগদানন্দবাবুর স্নেহ ভালোবাসা পূর্ণ মন তাঁকে উদার মানসিকতা গঠনে সাহায্য করেছিল। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সর্বাধ্যক্ষ ক্ষিতিমোহনবাবুর ব্যক্তিত্ব ছাড়াও তৎকালীন কলকাতার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রমথনাথের পরিচয় গড়ে উঠেছিল। সাহিত্যকদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি গাঙ্গুলি, সুনীতি চাটুজ্জে, প্রশান্ত মহলানবিশ, কালিদাস নাগ, অমল হোম ছাড়াও বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু ও ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রমথনাথের অন্তরঙ্গ তা গড়ে উঠেছিল। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের নাট্যাভিনয় দেখবার জন্য শান্তিনিকেতনে আসতেন। প্রমথনাথ অবাক দৃষ্টিতে এই প্রতিভাধর সাহিত্যিক ও মনীষীদের লক্ষ্য করতেন। পরোক্ষভাবে প্রমথনাথের মনোজগৎ গঠনের পেছনে এঁদের অবদান ছিল সন্দেহ নেই।

শান্তিনিকেতনের অপর শিক্ষকদের মধ্যে মজলিসী রসিক ক্ষিতিমোহনবাবু, নগেনবাবু, ও জগদানন্দবাবুর নিপুণ হাস্যরসিকতায় তিনি ছিলেন মুগ্ধ। শব্দকে ঘুরিয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে রস বের করবার ক্ষমতা প্রমথনাথকে গল্পরচনায় উৎসাহিত করেছিল।

প্রমথনাথের সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উদার মানবধর্ম ও বিরাটত্বের চেতনা জাগ্রত হয়েছিল শান্তিনিকেতনে ব্রাহ্ম পদ্ধতিতে উপাসনায় অংশগ্রহণের ফলে। প্রত্যুষে, বৈকালিক ও সান্ধ্য উপাসনায় প্রাচীন ঋষিগণের উপদেশ থেকে শুরু করে খৃষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য, কবীর ইত্যাদি ধর্মগুরুদের উপদেশ পাঠে ধর্মের সর্বজনগ্রাহ্য মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা হত। প্রমথনাথ উপাসনায় নিয়মিত অংশ নিতেন। এই প্রভাব প্রমথনাথ অকপটেই স্বীকার করেছেন এই আদর্শ সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা প্রমথনাথের ছিল একান্ত প্রিয়। ৭ই পৌষ মহর্ষির দীক্ষা ও আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবস, ৮ই পৌষ আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রদের উৎসব এবং ৯ই পৌষের স্মরণ সভার প্রমথনাথের ভূমিকা ছিল সক্রিয়। এই আনন্দযজ্ঞে অংশ গ্রহণ করে প্রমথনাথ বৃহৎ জগতের রক্তচলাচল অনুভব করার সুযোগ পেতেন। শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা মহামেলায় পরিণত হত, শুধু সারা বাংলার মিলন তীর্থ হিসেবেই নয় সমগ্র ভারতের মিলন তীর্থে পরিণত হয়েছিল। আমাদের দেশের অসংখ্য কবি সাহিত্যিক আসতেন এই মিলন মেলায়, জগদীশচন্দ্রের মতো বৈজ্ঞানিক, সত্যেন্দ্রনাথ, অন্নদাশঙ্কর, লীলা মজুমদার থেকে শুরু করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত এই মেলায় আসতেন। প্রমথনাথের সঙ্গে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের পরিচয় ঘটত যা তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির পরিমন্ডল গড়ে তুলেছিল।

এছাড়াও পৌষমেলাকে কেন্দ্র করে যে কীর্ত্তন, বাউলসঙ্গীত ও সাঁওতালী নাচ অনুষ্ঠিত হত সেই প্রভাব তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

সেই সঙ্গে বসন্ত উৎসবের সময় বসন্তরাত্রির বৈতালিক গানের সুর, হোলী, আবীরে পরিপূর্ণ হত, শান্তিনিকেতনের পরিবেশ । শাল, পলাশ বীথিকার তলে তলে, জ্যোৎস্নার আলোর ফাঁকে ফাঁকে যে সঙ্গীতময়তার সৃষ্টি হত প্রমথনাথের মনোভূমিতে সে প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশী। এজন্য তাঁর বহু উপন্যাসে আবীরের অনুষঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায়।

আশ্রমিক পরিবেশে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, অভিনয়, চিত্রপ্রদর্শনী ও সাহিত্যের আসর বসত। সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক সাহিত্যসভা শান্তিনিকেতনের জীবনের অঙ্গ ছিল; প্রমথনাথের উপর সাহিত্য সভা সাজাবার দায়িত্ব আসত। বস্তুত তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু হয়েছিল এখান থেকেই। অল্প দিনের মধ্যেই শিক্ষক কালিদাস বাবুর কাছ থেকে

কবিতা রচনার নতুন কৌশল আয়ত্তে এনে কবিখ্যাতি লাভ করলেন প্রমথনাথ। তিনি সাহিত্য সঙ্গী হিসেবে পেয়েছেন শ্রী সতীশ চন্দ্র রায়কে। সে সময় সতীশচন্দ্র রায় ছিলেন বিশ্বভারতীর প্রথিত যশা কবি। সতীশচন্দ্রের মতো সুপ্রতিষ্ঠিত কবি হবার বাসনা প্রমথনাথ পোষণ করতেন। গুরুদেব যখন জানতে পেলেন প্রমথনাথ একজন কবি তখন তাঁর মন সৃষ্টির আনন্দে হয়ে উঠেছিল উল্লসিত। প্রখর মধ্যাহ্নে শালবীথিকার তলে রবীন্দ্রবন্দনা করে লিখলেন নতুন কবিতা —

'' সেই মহাগীত ছন্দে সেই মহা তালে
তুমি গাহিয়াছ গান ঊষা সন্ধ্যাকালে—
শেষের ছত্রটা ঃ
শুনো গুরুদেব, তব শিশুদের গীতি।''

এরপর বড়দের সাহিত্যসভায় অংশ গ্রহণের সুযোগ এল প্রমথনাথের। ইংরেজী সাহিত্যের ভাবধারায় শুরু হল গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ লেখা, যা সে সময় বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর ঘটাতে পেরেছিল সন্দেহ নেই। সাহিত্য সভায় আমন্ত্রিত রবীন্দ্রনাথ হৈমায়লিক ধৈর্য নিয়ে নীরবে পাঠ শুনতেন এবং শেষে সমালোচনা করতেন। কখন কখন কঠোর সমালোচনার দ্বারা প্রমথনাথের যুগান্তকারী রচনাগুলো তচনচ করে দিতেন পুনরায় নতুন যুগান্তকারী রচনা নিয়ে উপস্থিত হতেন কবিগুরুর দ্বারপ্রান্তে।

শান্তিনিকেতন থেকেই তিনি প্রাইভেটে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন। এই সংবাদ শ্রাবণ সংখ্যা ১৩২৬ প্রথমবর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (শান্তিনিকেতন) প্রকাশিত হয়েছে আশ্রম সংবাদ শিরোনামায় —

৬। "শ্রীমান প্রমথনাথ বিশী এবারে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, বিশ্বভারতীতে অধ্যয়ন করিতেছেন।"[৬]

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর কলেজ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তামাশা করে বলেছিলেন -

"কলেজে পড়ে কি করবি! যে কলে পড়লে মানুষের লেজ গজায় তাকেই কলেজ বলে।"[৭]

সে যাই হোক, প্রমথনাথের আর কলেজে পড়া হল না। চলমায় নামে এক দক্ষিণ ভারতীয় আর প্রমথনাথ এই দুটি ছাত্র নিয়ে 'বিশ্বভারতী'র পত্তন হল। প্রমথনাথ বিশ্বভারতীতে যখন পড়াশুনা করতেন তখন শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের অধ্যাপনার কাজও করতেন।

বিশ্বভারতী পত্তনের পর দুজন ছাত্রের অধ্যাপনার ভার রইল শাস্ত্রী মহাশয়ের উপর। এসময় রবীন্দ্রনাথের আদেশ হল ছাত্রদের পাণিনির ব্যাকরণ পড়তে হবে। আশ্রমের অধ্যাপকদেরই পাণিনি অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করলেন। প্রমথনাথও ছাত্র হিসেবে শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে পাঠ গ্রহণ করতেন।

বিশ্বভারতীতে অধ্যয়নকালে প্রমথনাথকে দুপুর বেলায় রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী পড়াতেন। একদিন পাঠের সময় "dying" শব্দের অনুবাদ 'মুমূর্ষু' বললেন, তাতে প্রমথনাথ আপত্তি জানালেন।

রবীন্দ্রনাথ বললেন ঃ তাহলে কি হবে ?

প্রমথনাথ — ম্রিয়মান'।

তিনি অবাক হয়ে বললেন — কে শিখিয়েছে রে ?

প্রমথনাথ — স্বয়ং ভগবান পাণিনি।

রবীন্দ্রনাথ শুনে 'থ' হয়ে গেলেন।

প্রমথনাথ ব্যাখ্যাচ্ছলে বললেন - ইচ্ছার্থে 'সন' প্রত্যয় হয়। লোকটার তো মরার ইচ্ছে ছিল না। তাই মুমূর্ষু না হয়ে হবে 'ম্রিয়মান'।

রবীন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন - "সর্বনাশ, তুই যে দেখছি বাঙলাও ভুললি, সংস্কৃতও শিখলিনা।"

প্রমথনাথ বললেন - যেমন ব্যবস্থা করেছেন। আগে অ্যালোপ্যাথির বিষ মরলে তবে তো হোমিওপ্যাথির গুণ মরতে আরম্ভ করবে। সবে বাংলা ভুলতে আরম্ভ করেছি, এর পরে সংস্কৃতজ্ঞানের বনিয়াদ পাকা হতে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথের বাক্‌স্ফূর্তি হলোনা, তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন - শাস্ত্রী মশাইকে বল যে, তোর আর পাণিনি পড়তে হবে না।

প্রমথনাথের পাণিনির পাঠ এখানেই শেষ হল।" [৮]

এভাবে প্রমথনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তর্কও মাঝে মাঝে জমে উঠত।

ঋষিকবি একদিন প্রমথনাথকে একটা গাছের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন - "তোকে অশোক গাছ বলে লাগিয়েছি, বোধ করি গাব গাছ।" প্রমথনাথের রচনার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শুধু তিরস্কারই পান নি পেয়েছিলেন অকুণ্ঠিত প্রশংসাও। রবীন্দ্র স্নেহধন্য প্রমথনাথের শিল্পীসত্তা এভাবেই জাগ্রত হয়েছিল।

রবীন্দ্র রচিত গানগুলো শান্তিনিকেতনের প্রত্যেকের প্রেরণার উৎস। আবেগপ্রধান গানগুলো প্রমথনাথের মনে মায়াগুণের সঞ্চার করেছিল সন্দেহ নেই। কোজাগরী পূর্ণিমা তিথিতে রবীন্দ্রনাথ প্রমথনাথকে একটা কবিতা লিখতে বললেন। প্রমথনাথ কবিতা লিখে

পাঠ করলেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতাও কোজাগরী পূর্ণিমার দিনে পাঠ হল এর পর শুরু হল গানের পসরা। বাংলাদেশের আকাশে চাঁদ উঠেছে অথচ গান হয়ে ওঠে নি তা তো হয় না। শুধু কোজাগরী উৎসবই নয়, পৌষউৎসব, শারোদোৎসব, বসন্তউৎসব, বর্ষশেষ, বর্ষারম্ভ, বর্ষামঙ্গল, শেষ বর্ষণ, শারোদোৎসব, নবান্ন, শ্রীপঞ্চমী, বনমহোৎসব, রাখীউৎসব মূলতঃ প্রকৃতি ও মানুষকে একসূত্রে গাঁথবার প্রয়াস। বসন্ত উৎসবে শুধু আবীর খেলাই নয়, আম্রকুঞ্জের সভাস্থলে আলপনা, আমের ডালে ডালে বাতির ব্যবস্থা করে গায়ক গায়িকারা পীতবর্ণের ধুতি ও শাড়ি পড়ে শুরু করত নৃত্য ও গানের সুর। প্রত্যেকটি উৎসবের সঙ্গেই থাকত গানের যোগ। প্রমথনাথের এই সঙ্গীতময় পরিবেশে থেকে সৃজনী প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল। উৎসবের প্রতীক উৎসবরাজ দিনেন্দ্র নাথ ঠাকুরের আন্তরিকতার অভাব ছিল না। সঙ্গীত ও অভিনয়ের খ্যাতি ছিল লোকপ্রসিদ্ধ। তাঁর কণ্ঠস্বর জাদুতে গদ্য ও পদ্য নূতনতর সঙ্গীতের স্তরে গিয়ে পৌঁছাত। প্রমথনাথ এরূপ ব্যক্তিত্বের সঙ্গেও ছিল অন্তরঙ্গতা। বিশ্বভারতীর ছাত্ররূপে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য বেশি করে পেয়েছিলেন, ঠিক এই সময়কালই প্রমথনাথের নাটক রচনা শিক্ষার শিক্ষানবিশি কাল হিসেবে চিহ্নিত। রবীন্দ্রনাথ নাটকের কাহিনী প্রমথনাথকে বলে দিতেন প্রমথনাথ কয়েকদিনের মধ্যেই নাটক লিখে রবীন্দ্রনাথকে দেখাতেন; রবীন্দ্রনাথ নাটকটি সংশোধন সংযোজন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ আকারে রূপায়িত করে দিতেন। ছাত্রজীবনে প্রমথনাথের লেখা যাত্রাপালা যখন 'রথের রসি', 'কালের যাত্রা'র রূপ পেল তখন প্রমথনাথ সেই নূতন সৃষ্টিকে নিজের নামে চিহ্নিত না করে গুরুপ্রণামী হিসেবে নিবেদন করেছেন। প্রমথনাথ রসিকতা করে বলতেন - গুরুদেব যখন যাত্রাপালা লিখবেন বলে মনস্থ করেন, তখন তিনি নাকি বলেছিলেন — সাহিত্যের অন্ততঃ এই শাখাটি আমাদের

145869 0 7 JAN 2002

জন্য খালি রাখুন। অভিনয় শিক্ষাগুরু রূপে তাঁর কাছে দুজনের নাম বিশেষভাবে অবিস্মরণীয় তাঁরা হলেন সন্তোষবাবু ও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। নাট্যকলাকৌশল আয়ত্ত করে তিনি একাধিক নাটক অভিনয় করেছেন। 'মুকুট' নাটকের ঈষা খাঁর অভিনয় করে তিনি নাট্যরসামোদী ব্যক্তিদের কাছ থেকে অজস্র হাততালি পেয়েছেন, এছাড়া 'বেণীসংহার' নাটকে অশ্বত্থমা চরিত্রের অভিনয় করে নাট্যাভিনয় কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন এবং 'বিসর্জন' নাটকের জয়সিংহের অভিনয় করে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছিলেন। রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ অভিনীত নাটকগুলো মঞ্চ উপস্থাপনা এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। শান্তিনিকেতনের রঙ্গ মঞ্চ বাদ দিয়ে রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস অপূর্ণ থেকে যায়। প্রমথনাথ পরিণত জীবনে কলকাতা ও রাজসাহীর পটভূমিকায় অসংখ্য নাটক উপহার দিয়েছিলেন। তবে তাঁর নাটকরচনার প্রেরণাস্থল যে শান্তিনিকেতন একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শান্তিনিকেতনে সাহিত্যসভা সাধারণতঃ উত্তরায়ণ গৃহেই বেশি অনুষ্ঠিত হত। একবার এই সভায় অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছিল ডঃ উইন্টর্‌নিজ ও ডঃ লেজ্‌নি, সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন গুরুদেব। প্রমথনাথের প্রবন্ধ লেখার সূত্রপাত হয়েছিল বিশ্বভারতী থাকাকালেই। ''রবীন্দ্রনাথের উপর কালিদাসের প্রভাব'' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমথনাথ লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের উপর উপনিষদের প্রভাব তেমন বেশি না হলেও কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' ও 'শকুন্তলা'র প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। ''রবীন্দ্রনাথ সমালোচনায় বললেন, তাঁহার কবি মন হাঁসের পাখার মতো, তাহাতে বাহিরের প্রভাব জলের মতো গড়াইয়া পড়ে।''[৯]

প্রমথনাথ শেলি ও কীট্‌সের কবিতাকে বেশি পছন্দ করতেন। শেলির কাব্যের অতীন্দ্রিয়, চিরচঞ্চল, রঙের তুফান, নিরুদ্দেশ যাত্রা, মেঘলোকে বিলীন ও অসীমের অনুভূতি

যেমন প্রমথনাথকে প্রভাবিত করেছিল ঠিকই তেমনি কীট্‌সের কাব্যের লুপ্তপন্থা, পুষ্পঘন, তম সুরভিত, অরণ্যরাজী, কোকিল কূজন, ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রভাবে তিনি প্রভাবিত। প্রমথনাথের প্রিয়তম কবিতা হল কীট্‌সের নাইটেঙ্গেল কবিতাটি। সাহিত্য রচনার শেষদিন পর্যন্ত কীট্‌সের কবিতা তার মনের উপর সোনার কাঠির পরশ লাগিয়েছিল। প্রমথনাথের কাব্যে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। 'শান্তিনিকেতন ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে —

" গত ২৩ শে ফেব্রুয়ারী (ফাল্গুন, ১৩২৭) কবিবর কীট্‌সের শততম বার্ষিক মৃত্যুতিথি উপলক্ষে আমাদের আশ্রমে একটি সভা হইয়াছিল। তাহাতে বিশ্বভারতীর ছাত্র শ্রী প্রমথনাথ বিশী "কীট্‌স" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।"[১০]

শান্তিনিকেতনে পত্র পত্রিকার প্রভাব ছিল প্রমথনাথের উপর সবচেয়ে বেশি। পত্রিকা প্রকাশের গুণগত মানের উপর ভিত্তি করে প্রতিযোগিতা চলত। " বড়োদের জন্য 'শান্তি', 'বীথিকা' মাঝারিদের জন্য 'প্রভাত' ও 'বাগান', 'শিশু','মুকুল' পত্রিকা নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হত।"[১১] পত্রিকাগুলি কোনটি ছিল সাপ্তাহিক , কোনটি পাক্ষিক আবার কোন কোনটি মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হত। এছাড়া হাতে লেখা দৈনিক কাগজও প্রকাশিত হত। একটা পত্রিকা প্রকাশের পরিমন্ডল গড়ে উঠেছিল সে সময়। প্রমথনাথের কবিতা শুধুমাত্র শান্তিনিকেতনেই সীমাবদ্ধ ছিল না কলকাতার 'প্রবাসী' পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল বহুবার।

এছাড়া শান্তিনিকেতনে ছাপাখানা স্থাপিত হবার পর বিভূতিগুপ্ত, প্রমথনাথ ও অমূল্য এই তিনজন মিলে একখানা সাপ্তাহিক কাগজ 'বুধবার' প্রকাশ করতেন। 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন তিনি। তিন বছর পত্রিকা সম্পাদনার

কাজে যুক্ত থেকে প্রমথনাথের সাহিত্যপ্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল।

'শান্তিনিকেতন' পত্রিকাকে ঘিরে যে সব স্বনামধন্য কবি সাহিত্যিকদের স্বচ্ছন্দ লেখনীর পদসঞ্চার ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভীমরাও শাস্ত্রী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কালীমোহন ঘোষ, অনিল কুমার মিত্র, তেজেশ চন্দ্র সেন, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, সুধাময়ী দেবী, ভারতচন্দ্র মজুমদার, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ কুমার মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দ্রকুমার চৌধুরী, ফণীন্দ্রনাথ বসু, অমিয় চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, লক্ষ্মীশ্বর সিংহ, কালাচাঁদ দালাল, দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর, নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, যদু কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ লেখকদের রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ ছিল 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকা। সে সময় সাহিত্য রচনার একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল উক্ত পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে। শান্তিনিকেতন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রমথনাথের রচনাগুলো শিল্পনিপুণতার পরিচয়বাহী।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত এবং ভারতের প্রতিবেশী দেশ থেকে আগত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ প্রমথনাথকে প্রসারিত মনোজগৎ গঠনের সহায়তা করেছিল। তিনি চীনদেশীয় সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন চীনদেশ থেকে আগত এলকুন-অ্যাং এর কাছ থেকে । তাছাড়া মালয়, ব্রহ্মদেশ, ঢাকা, গুজরাট, ত্রিপুরা, রাজসাহী, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র ও সিন্ধুপ্রদেশ থেকে বিশ্বভারতীতে বিভিন্ন ছাত্রদের প্রবেশের ফলে বিশ্বভারতী হয়ে উঠেছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ক্ষেত্র।

শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারে গ্রন্থের সংখ্যাও কম ছিল না। প্রমথনাথ ছিলেন গ্রন্থাগারের একান্ত মনোযোগী পাঠক। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে জ্ঞানভান্ডারকে আরও প্রসারিত করে দিয়েছিল এখানকার গ্রন্থাগার।

" সে সময় শান্তিনিকেতনে পুস্তক সংখ্যা ছিল দশ হাজারের বেশি।"[১২]

প্রমথনাথের চরিত্রে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল একগুঁয়ে স্বভাব। হিতোপদেশচ্ছলে যদি কেউ বলত " অমুক বইটো পড়িয়ো" তবে একরকম নিশ্চিন্ত যে বইখানা তার আর পড়া হল না। তবে বৈদেশিক ক্লাসিকস্ সাহিত্যের উপর প্রমথনাথের অনুরাগ ছিল সর্বাধিক।

বৈকালিক চায়ের আড্ডায় জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের যে সাহিত্য আলোচনা হত প্রমথনাথ সেখানে মজলিসের আসরে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। তেজেশবাবু, দীনুবাবু, অক্ষয়বাবু, সন্তোষবাবু, ক্ষিতিমোহন বাবু ও অসিতবাবুদের আড্ডায় প্রমথনাথের ছিল অবাধ প্রবেশ।

রবীন্দ্র স্নেহধন্য সন্তোষ মজুমদারের অসাধারণ সৌজন্য ও ভদ্রতাজ্ঞান — দুটি মিষ্টি কথা, দুটি কুশল প্রশ্ন, ছাত্রদের সঙ্গে একান্ত অন্তরঙ্গতা, আশ্রমকে একান্ত নিজের মনে করা ইত্যাদি মহৎগুণগুলো প্রমথনাথের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরিণত বয়সে অধ্যাপনাকালে ছাত্রদের সঙ্গে প্রমথনাথের অন্তরঙ্গতার পরিচয় ঘটেছে।

মিষ্টার অ্যান্ড্রুজের মতো ধর্মপ্রাণ মানবপ্রেমিক এবং মিষ্টার পিয়র্সনের আশ্রমিক পরিবেশকে একান্ত আপনার করে নেবার মানসিকতা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। এছাড়াও মহাত্মা গান্ধীর মতো মহাপ্রাণ মহাপুরুষ, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর মত প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব, রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচক ও শান্তিনিকেতনের ইংরেজী শিক্ষক অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী, অঙ্ক ও ইতিহাস শিক্ষক শরৎকুমার চক্রবর্ত্তী, সুবক্তা কালীমোহন ঘোষ, সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাপুরুষের বাণী সংগ্রাহক ক্ষিতিমোহন সেনের পান্ডিত্য, সরলতা, সরস বক্তব্য ও সামাজিকতাগুণ প্রভৃতি অনন্যসাধারণ এই চরিত্রগুলির প্রভাব প্রমথনাথকে প্রসারতা দান করেছিল সন্দেহ নেই।

আরেও অনেকের প্রভাব প্রমথনাথের ব্যক্তিজীবনে পড়েছিল তন্মধ্যে বিধুশেখর শাস্ত্রীর সংস্কারমুক্ত মন প্রমথনাথের ছিল শিক্ষার বিষয়। শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি বিশেষগুণ ছিল সকলের সঙ্গে প্রাণ খোলা ব্যবহার। শান্তিনিকেতনে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পারসিক প্রভৃতি নানাধর্মের লোকের প্রতি তার সমান মর্যাদা শ্রদ্ধা ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করে এক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন যা প্রমথনাথের কাছে ছিল একটা আদর্শ।

নেপালবাবুর শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণের সঙ্গেও জনসেবা, অসহযোগ আন্দোলনের অংশগ্রহণ প্রমথনাথের স্বদেশানুরাগ জাগ্রত করেছিল।

প্রমথনাথ ছিলেন কবিগুরুর মতো প্রকৃতি প্রেমিক ও প্রাণপূজারী। তাঁর বৃক্ষপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পপ্রীতিও ছিল অসাধারণ। প্রমথনাথ গাছ ও ফুলকে আলাদা করে দেখেন নি, শান্তিনিকেতনের ফুলের সঙ্গে গাছকেও কবিমনে সমানভাবে প্রতিভাত হয়েছে। "শান্তিনিকেতনে উত্তরায়ণের কোনার্ক নামক একটি বাড়ীর প্রাঙ্গনে একটি বিদেশী লতা রোপণ করেছিলেন। তার নীল পুষ্পসম্ভারে আকৃষ্ট হয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ লতাটির নাম দেন নীলমণিলতা।"[১৩] "এই লতায় ফুল ফুটলে তিনি সকলকে ডেকে ডেকে এর সৌন্দর্য দেখাতেন।" [১৪]

শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকতা প্রমথনাথের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। পূর্ব পশ্চিমে শালগাছের সারি, উত্তরে দেবদারু গাছের সারি এছাড়া আমলকী, সেগুন, শিমূল, কাঞ্চন, বকুল, মন্দার, পলাশ, আম্রকুঞ্জ, এছাড়া বাসন্তী, বনপুলক, পেয়ালী, ছাতিম, গোলক চাঁপা প্রভৃতি গাছের সমারোহ। আবার ঋতুতে ঋতুতে নানা ফুলের সমারোহ মালতী, কেয়া, শাল ও মহুয়ার ফুল, শিউলি ফুলের বীথি, গোলক চাঁপা, মাধবী, মুচকুন্দ, রক্তকবরী,

কৃষ্ণচূড়া, চামেলী, কেতকী, কদম্ব ফুলের প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ স্পর্শ অনুভব করেছেন প্রমথনাথ। শান্তিনিকেতনের ছাতিম তলায় ছাতিম ফুলের উগ্রমদির গন্ধ, উত্তরায়ণে হেনা, রজনীগন্ধার সুরভি, ঝুমকো ফুলের সুবাস এক অদৃশ্য কস্তুরী মৃগের মত লেখকের মনকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। শান্তিনিকেতন ছিল প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র। মানুষ, ভগবান ও প্রকৃতি এই তিন সত্তার সঙ্গে সচেতন ছিলেন প্রমথনাথ যদিও এ শিক্ষা তিনি পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে।

প্রমথনাথের প্রকৃতি প্রেম কত গভীর তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিদ্যুতায়নের জন্য পথের ধারের গাছের ডালপালা কাটা হলে বনলক্ষ্মীকে এরূপ অঙ্গহীন করবার জন্য তিনি বড় আঘাত পেয়ে এক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখলেন। রবীন্দ্রনাথ জগতের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতির কবি - অথচ প্রকৃতির এই অবমাননায় প্রমথনাথের কবিমন হয়েছিল বেদনাবিধুর।

উদ্ভিদের সঙ্গে পাখীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। " গাছের ফুলকে আমরা যেমন সহজে ভালবাসি, আকাশের পাখির প্রতি ভালবাসা তেমনি সহজাত।"[১৫]

প্রমথনাথের শান্তিনিকেতনে পাখীর ডাক শুনে যে সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হয়েছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন —

" গাছপালায় ভরা শান্তিনিকেতনে ভোররাত থেকে নানারকম পাখির গান উঠতে থাকে। প্রথমে দেবদারু গাছগুলোর মধ্যে কিচির মিচির রবে মিশ্র গান ওঠে যেন সুরের রংমশাল। তারপর ফিঙ্গে, দোয়েল, শালিক প্রভৃতির রব, অবশেষে একসময় কোকিল গান শুরু করে দেয় - তবে জ্যোৎস্না রাত হলে সারারাত ধরে ডাকে, কেন গলা ভেঙ্গে যায় না সে এক বিস্ময়।"

শান্তিনিকেতনের নৈসর্গিক পরিবেশের সঙ্গে সাঙ্গীতিক পরিবেশ একসূত্রে গাঁথা। রবীন্দ্রনাথ যেমন পাখীদের কথা কানে কানে শুনতে পেতেন ঠিক তেমনি শান্তিনিকেতনের পাখীদের ডাক, মৌমাছির গুঞ্জন, কোকিলের কু-উ-উ ডাক শুনেছেন। তাঁর উপন্যাসে বুলবুল, ময়না, চন্দনা, কাক, চামচিকা, বক, হাঁস, রাজহাঁস, ঘুঘু, মোরগ প্রভৃতি পাখির উল্লেখ আছে।

প্রমথনাথ বীরভূমের প্রকৃতির সঙ্গে দ্বৈতরূপ দেখেছেন একদিকে রুক্ষ লাল কঙ্করময় মাটি, রুক্ষ গিরিরাজি, কাঁসাই, ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, ময়ুরাক্ষী, বক্রেশ্বর, কোপাই, অজয় এর দ্বৈতরূপ আর বীরভূমের মাটির প্রকৃতিতেও দ্বৈতলীলা। শাল, পিয়াল, মহুয়া, আম, জাম, কাঁঠাল, তাল, খেজুর ও ধান্যশীর্ষের স্নিগ্ধ শ্যামলতা ঘিরে প্রকৃতি।

শান্তিনিকেতন ও তাঁর নিকটবর্তী স্থানগুলোর সঙ্গেও প্রমথনাথের ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তারাপীঠ, লাভপুর, নলহাটি, কঙ্কালীতলা, নান্নুর, কেন্দুলী, দুবরাজপুর, বক্রেশ্বর, তালবনী, বোলপুর, সিউড়ী প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলোতে প্রমথনাথ গিয়েছেন। সেখানকার মাটি, মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে তার গভীর নৈকট্য গড়ে উঠেছিল। একতারা বাজিয়ে বাউলদের মনের মানুষ খোঁজা ও জয়দেব, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর সুরে মুখরিত বীরভূমের আকাশ বাতাস। প্রমথনাথ বৈচিত্র্যময় বীরভূমের উল্লেখ করেছেন তাঁর কোপবতী উপন্যাসে, অসংখ্য কবিতাগুচ্ছ এবং ছোটগল্পে।

বীরভূমের সাঁওলাত পল্লীর সঙ্গে প্রমথনাথের সম্পর্ক ছিল মধুর। সাঁওতালদের জীবনযাত্রা, তাদের ভাষা ও তাদের নাচ প্রমথনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। কোপবতী উপন্যাসের ভৌগোলিক পটভূমি ছিল বীরভূম জেলার তালবনী গ্রাম। এই গ্রামে প্রমথনাথ একাধিকবার

গিয়েছেন সেখানকার মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন তিনি।

সুদীর্ঘ সতেরো বছরের শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতে অধ্যয়ন কালে অতসী নামে এক মেয়ের সঙ্গে প্রীতিমধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল প্রমথনাথের। 'অকুন্তলা' কাব্যগ্রন্থের 'ক্যালকাটা রোডে' কবিতায় প্রমথনাথ বর্ণনা করেছেন দার্জিলিং এর এই রোডে দীর্ঘ ছ বছর বাদে দেখা হয়েছিল, অতসী ও প্রমথনাথ তখন দুজনেই বিবাহিত। কবি লিখেছেন ঃ-

"অতসীর সনে মোর ছিল পরিচয়
বন্ধুরা বিদ্রূপ করি বলিত প্রণয়।" [১৬]

কবিতীর্থ শান্তিনিকেতন পর্বে সতেরো বৎসর কাল থেকে প্রমথনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একান্ত অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। এছাড়াও প্রায় ত্রিশ বছরের বেশি দেখেছেন রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে, নানা স্থলে, নানা উপলক্ষে। তিনি দেখেছেন একদিকে তাঁর প্রতিভার বহুমু খিতা অপরদিকে দেখেছেন তাঁর ব্যক্তিত্বের নানা দিক। তাঁর মুখের স্নেহমিশ্রিত ভাব যেমন প্রমথনাথ ভোলেননি অপরদিকে তাঁর বিরক্তিকেও ভুলে যেতে পারেন নি কখনও। প্রতিভাবান ব্যক্তিদের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ গ্রহণ করবার ক্ষমতা অনেক বেশি - প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এটা বহুবার প্রত্যক্ষ করেছেন।

শিক্ষাসূত্রে শান্তিনিকেতনে ১৭ বৎসরকাল পর্ব অবস্থান কালে শান্তিনিকেতন প্রমথনাথকে অনেক দিয়েছে - দিয়েছে সবচেয়ে বেশি যেটা তা হল সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতো একজন মনীষীর সান্নিধ্যে এসে বড়ো হবার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। তাই কবিতীর্থ শান্তিনিকেতন প্রমথনাথের জীবনে সাহিত্য সৃষ্টির উন্মেষের শ্রেষ্ঠ সময় ও প্রতিভা বিকাশের অন্যতম কাল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে তা নিঃসন্দেহে কবিতীর্থ

শান্তিনিকেতন কৈশোর ও যৌবনের লীলাভূমি। 'রবীন্দ্রনাথ' কাব্যগ্রন্থের গুরুদেব কবিতায় তিনি লিখেছেন —

" স্বপ্নরূপে তুমি প্রবেশ করেছ মজ্জায়,
ধমনীতে ধ্বনিত তোমার ছন্দ,
গানের ভারে ভেঙে পড়েছে আমার স্নায়ুতন্ত্রী
বসন্তের ফুলে যেমন ভাঙে মালঞ্চের বিতান। " [১৭]

প্রমথনাথের জীবনে শান্তিনিকেতনের কৈশোর ও যৌবনের মধুমাখা স্মৃতি যেমন চিরঅঙ্কিত হয়ে আছে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে রাজসাহী ও কলকাতার প্রসঙ্গ সঙ্গত কারণেই এসে যায়। কেননা একক কোন স্থানের মূল্যায়নে সমগ্র সত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না এজন্য রাজসাহী ও কলকাতা পর্ব তাঁর জীবনে শান্তিনিকেতন পর্বের মতো উল্লেখযোগ্য পর্ব হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

এই ত্রিকোণ পৃথিবী প্রমথনাথের সাহিত্য সৃষ্টির নেপথ্যে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই ত্রয়ী ভৌগোলিক পটভূমি প্রমথনাথের জীবনে সমগ্রতার দ্যোতকস্বরূপ।

রাজসাহী পর্ব

প্রমথনাথ এবার শান্তিনিকেতনের 'বীথিকাগৃহ' থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। জন্মভূমি রাজসাহীতে ফিরে ১৯২৭ এ বিশ্বভারতী থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করবার পর রাজসাহী কলেজে বি.এ পড়বার জন্য ভর্ত্তি হন। দুবছর পরে ১৯২৯এ কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ পাশ করেন। রাজসাহী কলেজে অধ্যয়ন কালে দেবেশ চন্দ্র রায় ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে একজন। দেবেশ চন্দ্র রায়ের "রাজসাহীতে দুবছর" প্রবন্ধে প্রমথনাথের কলেজ জীবন সম্পর্কে ও তাঁর মানসিকতার গুরুত্বপূর্ণ দিক আমরা জেনে নিতে পারি।

গতানুগতিক জীবনধারা থেকে প্রমথনাথ ছিলেন একেবারে মুক্ত — রবীন্দ্র ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন তিনি। দেবেশ চন্দ্র রায়ের স্মৃতিচারণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

" তিনি ছিলেন স্বল্প ভাষী, মিতাহারী, পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে উদাসীন। ঘনিষ্ঠ পরিধির ভিতর ভিন্ন ভিন্ন আড্ডা দেওয়া, গল্প করা - বড় একটা করতেন না। অবসর সময়ে খালি পায়ে বারান্দায় পায়চারি করতেন অথবা বিছানায় শুয়ে পা দোলাতেন আর সব সময়ই থাকত হাতে বই। তার বেশির ভাগই ছিল ইংরেজী সাহিত্যের সমালোচনা — বিশেষ করে সেকস্‌পীয়রের। [১৮]

প্রমথনাথের চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি সব সময় আবেগের বিরোধিতা করতেন। এজন্য রাজসাহী কলেজে অনেকের পরিচিত হলেও অনেকের জনপ্রিয় হতে পারেন নি।

কলেজে অধ্যয়ন কালেই তাঁর 'দেয়ালি' ও 'বসন্তসেনা' নামে দুখানা কাব্যগ্রন্থ এবং

'দেশের শত্রু' নামে একখানা উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

সে সময় কলেজের ছাত্ররা দেশপ্রেমে বিশেষভাবে উজ্জিবিত - দেশের জন্য আত্মত্যাগ ছিল প্রধান আদর্শ। তরুণ স্বদেশী ছাত্ররা স্টেটস্‌ম্যান পাঠ করে দেশনেতাদের বক্তৃতা শুনে স্বদেশ সেবক রূপে নিজেদের মনে করত। কিন্তু প্রমথনাথের 'দেশের শত্রু' উপন্যাসে অসহযোগ আন্দোলনে যে সব দেশপ্রেমিক অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের এবং স্বদেশ প্রাণ কবিদের শাণিত বিদ্রূপ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার গুণগ্রাহী পাঠক ছিলেন প্রমথনাথ। অন্য কোন কবির দেশাত্মবোধক কবিতাকে গুরুত্ব দিতেন না তিনি।

দেবেশ চন্দ্র রায় একদিন জানিয়েছিলেন প্রমথনাথকে তাঁর উপন্যাসের নাম 'দেশের শত্রু' না লিখে দেশের বন্ধু লিখলে বইটি বেশি বিক্রি হত ও অনেক টাকাও পেতেন। তার প্রত্যুত্তরে প্রমথনাথ জানালেন —

''টাকা রোজগারই যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হত তবে তাহলে আমি কবিতা না লিখে পাটের ব্যবসা করতাম।'' [১৯]

তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রাজসাহী শহরে যে স্বদেশী মিটিং অনুষ্ঠিত হত প্রমথনাথ উক্ত মিটিং এ যাবার অনুৎসাহ প্রকাশ করতেন এবং অন্যান্য তরুণ ছাত্রদেরও নিরুৎসাহিত করতেন। আবার কখনও মিটিং এ গেলে বক্তার উত্তেজনাময় বক্তৃতা তঁকে সাড়া জাগাতে পারত না তিনি অনেকটা উদাসীন ছিলেন এ ব্যাপারে।

রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে প্রমথনাথ ছিলেন নরমপন্থী মতবাদের বিশ্বাসী তিনি চরমপন্থী দলের আদর্শকে সমর্থন করেন নি। বিপ্লবীদের সম্পর্কে তিনি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতেন

এবং বন্ধুদের বিপ্লবী সংসর্গ থেকে দূরে থাকতে বলতেন। এক বিপ্লবী নেতার দৃষ্টি পড়েছিল প্রমথনাথের উপর এক বন্ধু প্রমথনাথকে একথা জানালে প্রমথনাথ বিচলিত হয়েপড়েন নি।

রাজসাহী কলেজে ও হোটেলে থাকাকালীন প্রমথনাথ রাজনীতিকে এড়িয়ে চলতেন। তবে তাঁর চরিত্রের মধ্যে একটা দৃঢ়তা লুকিয়ে ছিল কখনও কলেজের কোন বিষয়ে কোন জটিলতা সৃষ্টি হলে প্রমথনাথ তাঁর বক্তব্য সজোরে প্রতিষ্ঠিত করতেন অনেক ক্ষেত্রে জনপ্রিয়মতের পক্ষে আসত না। কি সাহিত্য বিষয়ক আলোচনায়, কি সমাজ বিষয়ক আলোচনায় কাউকে তোয়াক্কা না করে নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন বলে প্রমথনাথের জনপ্রিয়তা ছিল খুবই কম।

প্রমথনাথ ছিলেন স্পষ্ট বক্তা জনমতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁর অকুতোভয়তার পরিচয় দিয়েছেন বহুবার। এক স্বদেশী নেতা বিদেশী কাপড় বর্জনের জন্য বিলিতিসিগারেট মুখে দিয়ে বিদেশী কাপড় পোড়াতে দেখে প্রমথনাথ কলেজ হোস্টেলের দ্বিতল থেকে চিৎকার করে বললেন -'' বিলিতি সিগারেট মুখে দিয়ে অন্যের কাপড় পোড়াতে লজ্জা করছে না?''[২০]

প্রমথনাথের অকুতোভয়তার আর একটি ঘটনা তুলে ধরা যেতে পারে ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৩৯ সালে। কলেজের এক উঁচু শ্রেণীর ছাত্রকে ইংরেজ সরকারের স্পাই ভেবে অন্যান্য ছাত্ররা যখন তাকে আঘাত করছিল এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মাথায় ঘোল ঢেলে গাধার পিঠে চাপিয়ে রাজসাহী শহর ঘোরাতে। প্রমথনাথ এতে তীব্র আপত্তি জানালেন, প্রমাণ ছাড়াই এধরণের কঠিন শাস্তি দেয়া সঙ্গত নয় একথা জানালেন ফলে তাঁর শাস্তি রদ হল। কাজেই প্রমথনাথের দেশপ্রেমের ধারণা ছিল ভিন্নধর্মী অকারণ উচ্ছ্বাসকে তিনি সর্মথন করেন নি।

যে কবিমন নিয়ে প্রমথনাথ শান্তিনিকেতন থেকে এসেছেন সেই সৌন্দর্যদৃষ্টি আরোও ব্যাপক ভাবে প্রতিভাত হয়েছিল রাজসাহী পর্বে। পূর্বে রাজসাহী ও নিকটবর্তী অঞ্চল সম্পর্কে কিছু আলোচিত হয়েছে তবুও বলতে হয় প্রমথনাথের জীবনে নদীর প্রভাব ছিল অপরিসীম। শান্তিনিকেতনের কোপাই নদী যেমন প্রমথনাথের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল ঠিক তেমনি রাজসাহীতে পদ্মার প্রভাব ছিল আরও সুদূরপ্রসারী। এছাড়া কলকাতা পর্বে ভাগীরথীর পরিচয় আছে, দিল্লীর নিকটবর্তী যমুনা নদীও সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। বীরভূমের কোপাই নদীকে ভালোবেসে প্রমথনাথ নাম দিয়েছেন কোপবতী। কখনো বনভোজন উপলক্ষে বেছে নিয়েছিলেন কোপাই এর তীরভূমি, কখনো বনভ্রমণে ও সান্ধ্যভ্রমণে কোপাই এর তীর বেছে নিয়েছেন। কোপাই এর উৎস সন্ধানে প্রমথনাথ গিয়েছেন, কোপাই এর সঙ্গে সপ্তদশ বর্ষব্যাপী প্রমথনাথের নিবিড় পরিচয় গড়ে উঠেছিল।

কবি 'কোপাই' কবিতায় লিখেছেন —

" তোমার তীরে আসবো ফিরে
বনভোজনে আমি,
বিশ্বাসেতে আমার কথা শোনো।"

তবে প্রমথনাথের সাহিত্যসৃষ্টিতে পদ্মার প্রভাব ছিল আরও বিচিত্র। পদ্মাকে তিনি কখনও নারী রূপে কখনও দেবী রূপে দেখেছেন। প্রায়ই প্রমথনাথ ছুটে যেতেন প্রকৃতির কোলে, পদ্মাবক্ষে ভ্রমণ করেছেন নৌকাযোগে কখনো বজরায়। পদ্মাকে কেন্দ্র করে 'হংসমিথুন' কাব্যগ্রন্থের কবিতা লিখেছেন, পদ্মার প্রেমে পড়ে - পদ্মানদী প্রমথনাথকে কবি করেও তুলেছে। 'পদ্মার চর', 'বর্ষার পদ্মা', 'মধ্যাহ্নের পদ্মা', 'সূর্যাস্তের পদ্মা' 'শীতের পদ্মা'।

'অপরাহ্নের পদ্মা', 'সন্ধ্যার পদ্মা' বিষয়ক কবিতাগুচ্ছে পদ্মার স্মৃতি ও সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। 'সূর্যাস্তের পদ্মা' কবিতায় ঃ-

" হে পদ্মা তোমার
বনরেখা বিবর্জিত দিগন্তের দেশে
ডুবে যায় শ্রান্ত রবি গলিয়া নিঃশেষে
বিন্দুমাত্র সার।" [২১]

এছাড়া 'রবীন্দ্রনাথ' কাব্যগ্রন্থে 'শিলাইদহের ঝাউ গাছ' কবিতায় পদ্মাতীরের শিলাইদহের অনবদ্য বর্ণনা দিয়েছেন।

প্রমথনাথ রাজসাহী জেলার জমিদারদের জীবন চিত্র বর্ণনা করেছেন তেমনি নিকটবর্তী দিনাজপুর, রাজসাহী, পাবনা, ফরিদপুরের আঞ্চলিক ভাষাও সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে।

দিনাজপুর, রাজসাহী, পাবনা প্রভৃতি জেলার দারোগা, জজ, ম্যাজিট্রেট প্রভৃতি চরিত্র, সাধারণ মানুষ কৃষক, রাজমিস্ত্রী থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বাস্তব পটভূমি প্রমথনাথের অভিজ্ঞতার আলোকে বর্ণনা করেছেন। তৎকালীন সমাজজীবনের ঘটনা প্রবাহ তাঁর দৃষ্টিতে এড়ায় নি।

প্রমথনাথের কলেজ জীবন শেষ হবার পর ১৯২৯এ রাজসাহীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা সুরুচি দেবীর সঙ্গে প্রমথনাথের বিবাহ হয়। পত্নী সুরুচি দেবী সাংসারিক সমস্ত দায়িত্ব মাথায় নিয়ে প্রমথনাথের সাহিত্যচর্চার প্রেরণাদাত্রী ছিলেন। শুধু মাত্র একজন পাঠিকা হিসেবেই নয় মূল্যবান মত প্রকাশ করেও প্রমথনাথকে সাহিত্যচর্চায় অনুপ্রাণিত করতেন। প্রিয়তমা পত্নী সুরুচি বিশীর, আন্তরিক সহযোগিতা ও সাহিত্য রচনায় যথেষ্ট উৎসাহদান

প্রমথনাথ স্বীকার করেছেন।

দুই পুত্র ও এক কন্যা এবং স্ত্রী সুরুচিকে নিয়ে প্রমথনাথের ছোট সংসার। জ্যেষ্ঠ পুত্র কনিষ্ক, কনিষ্ঠ পুত্র মিলিন্দ ও কন্যা চিরশ্রী প্রমথনাথের একান্ত স্নেহধন্যা। কন্যা চিরশ্রী বর্তমানে দিল্লীর একটি প্রতিষ্ঠিত মহাবিদ্যালয়ে বাংলা অধ্যাপিকা হিসেবে নিযুক্ত।

প্রমথনাথের শিক্ষাজীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় সুপ্রশংসিত সাফল্য। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

কলকাতা পর্ব

প্রমথনাথ জন্মসূত্রে রাজসাহীর মানুষ হলেও কর্মসূত্রে লেকগার্ডেন্সএ স্থায়ীভাবে বাস করেন এবং আমৃত্যু সেখানে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়।

তাঁর কর্মজীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত রামতনু লাহিড়ী সরকারী গবেষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। 'রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ' গবেষণামূলক গ্রন্থটি প্রমথনাথের রবীন্দ্রসমালোচনামূলক গ্রন্থের অন্যতম। আবার ১৯৩৬ থেকে একটানা দশ বছর কলকাতার রিপন কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকেন। ১৯৪৫ সালে তাঁর কর্মজীবনের পরিবর্তন ঘটে। একাদিক্রমে দশ বছর সেখানে অধ্যাপনার পর ১৯৪৬ এ আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিকতায় চলে আসেন। স্বল্পকালের মধ্যেই আনন্দবাজার পত্রিকার 'এ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর' পদে উন্নীত হন। তিনি আবার

প্রত্যাবর্তন করেন অধ্যাপকরূপে। ১৯৫০ এ আনন্দবাজার পত্রিকার চাকুরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপকরূপে ও বিভাগীয় প্রধানরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৫০ থেকে ১৯৬৬র উত্তরার্ধ অবধি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। শেষ কয় বছর রবীন্দ্রস্মারক চেয়ারের অধ্যাপকপদে বৃত হওয়া তাঁর যোগ্যতারই স্বীকৃতি।

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার মাননীয় সদস্যরূপে নির্বাচিত হন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের উত্তরণ ঘটে ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে মনোনয়নের মধ্য দিয়ে।

কর্মজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করে প্রমথনাথ তাঁর রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। পত্রিকা সম্পাদক পদ থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘটনা ও বহুমুখী সাহিত্য নিয়ে দৈনন্দিন যে কর্মপ্রবাহ চলছিল তার প্রতিফলন ঘটেছে বিভিন্ন প্রবন্ধে ও ছোটগল্পের পাতায়। বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয়সূত্রে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চার হয়েছিল সেগুলো ধরা পড়েছে। এছাড়া শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি শিক্ষার ত্রুটিগুলো সমাধানের চেষ্টা করেছেন। রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যে ফুটে উঠেছে।

প্রমথনাথ ছিলেন নট নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক। কলকাতা রঙ্গমঞ্চকে তিনি পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এ ব্যাপারে তাঁর সাফল্য ছিল প্রশংসাতীত।

প্রমথনাথের মানসিকতার প্রেক্ষাপট অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁর পরিচিতি জগৎ, যে জগতে তিনি মানুষ হয়েছেন সেখানকার প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে প্রতিটি মুহূর্তে। তাঁর মানসিক প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছিল শান্তিনিকেতনে, রাজসাহীতে, কলকাতায় তাঁর পরিচিতি পরিবেশের মধ্যে। এই পরিচিতি জগতের মধ্যে

থেকেই সাহিত্যের সাধনা তিনি করেছেন — সাহিত্য বিষয়ক চিন্তা, ভাবনা, কল্পনা, ধ্যান করেছেন তা নিজস্ব প্রতিভার দান। তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল নিভৃত নির্জনতায়। নিভৃতির মনোভূমিতেই সাহিত্যকুসুম প্রস্ফুটিত হয়েছিল, তাঁর মনোভূমিতে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে। যা সকল প্রকার সাহিত্যের মূল উৎসস্বরূপ। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই বৈচিত্র্যময় সাহিত্যের আদি জননীস্বরূপ।

তবে নির্জন সাধনার কথা বলা হলেও সাহিত্য সঙ্গী জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করে সন্দেহ নেই। এজন্যই দেশে দেশে সাহিত্যে সাহিত্যে সাহিত্যিক আড্ডার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রমথনাথ নিজেও ছিলেন আড্ডাপ্রিয়। শান্তিনিকেতনের সাহিত্যের আড্ডায় তিনি বসেছেন কলকাতা পর্বেও সাহিত্যের আড্ডার সঙ্গে তাঁর গভীর যোগ ছিল। এজন্য বলা হয় —

'' সৃজনধর্মী মানুষ মাত্রই আড্ডাধর্মী। মননক্রিয়াকে সজীব এবং সচল রাখতে হলে সমধর্মী মানুষের সঙ্গে সংযোগ চাই। রাজনীতিতে যেমন গণসংযোগ সাহিত্যে তেমনি গুণীসংযোগ।[২২]

সাহিত্যকে প্রমথনাথ পেশা হিসেবে না নিয়ে বরং নেশা হিসেবেই নিয়েছেন। নেশাখোরদের চাই সঙ্গী। এজন্য গড়ে উঠেছে সংঘ, গোষ্ঠী ও আড্ডার আসর। যদিও বাংলাসাহিত্যের আড্ডা 'ভারতী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। বলাবাহুল্য এই আড্ডায় অনেক সুসাহিত্যিকের অভাব ছিল না। কল্লোল পত্রিকার আড্ডা ছিল সবচেয়ে বড়। শান্তিনিকেতনের আড্ডা রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই গড়ে উঠেছিল। বিশ্বভারতীর যুগে এই আড্ডা ছিল রসসৃষ্টির সহায়ক। এ সময় শান্তিনিকেতনে খাঁটি সাহিত্যিকের জন্ম হয়েছিল।

তন্মধ্যে সৈয়দ মুজতবা আলি, প্রমথনাথ বিশী এবং রাণী চন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা প্রত্যেকেই শান্তিনিকেতনের আড্ডাজাত। তিনজনেই বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।

প্রমথনাথের আড্ডার আসর গড়ে উঠেছিল সাহিত্য পত্রিকাকে ঘিরে বিশেষতঃ 'কথা সাহিত্য' 'কল্লোল' পত্রিকা ও 'প্রগতি' পত্রিকাকে ঘিরে। কলকাতার আড্ডায় প্রমথনাথ নিয়মিতভাবে অংশ নিতেন। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুবোধ ঘোষ পরিবৃত যে নিয়মিত আড্ডার আসর বসত প্রমথনাথ সেই আসরে সক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন। এরূপ সাহিত্যিক আড্ডা ছাড়াও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রসঙ্গে অধ্যাপক পরিবৃত শিক্ষামূলক আলোচনা আসরে যোগ দিতেন। ছাত্রদের সঙ্গেও তাঁর সাহিত্য আলোচনা হত। তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনজন ছাত্রছিল একান্ত স্নেহধন্য তাঁরা প্রত্যেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত। ডঃ বিজিত কুমার দত্ত, ডঃ প্রণয় কুমার কুন্ডু ও সুবোধ ঘোষ। ডঃ বিজিত কুমার দত্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। প্রমথনাথ বিশীর তত্ত্বাবধানে 'বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস' গবেষণামূলক গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান। এছাড়াও প্রমথনাথ বিশীর স্নেহধন্য ছাত্র শ্রী প্রণয় কুমার কুন্ডু উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক - সুদীর্ঘ অধ্যাপনা জীবনে তিনি গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। প্রমথনাথ শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের প্রতি একান্ত অনুরাগী ছিলেন, তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী ডঃ প্রণয় কুমার কুন্ডু মহাশয় গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি হয়ে উঠেছিলেন একান্ত অনুরাগী। তাঁর লেখা ''রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য'' মৌলিক চিন্তাধারার সাক্ষ্য বহন করে। সুবোধ ঘোষের পরিচয় এক বিশিষ্ট সাহিত্যিক হিসেবে।

কলকাতার লেকগার্ডেনএ বসবাসকালে নগরজীবনের সঙ্গে প্রমথনাথের ঘটেছে সার্বিক পরিচয়। কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের অংশীদার হয়ে তিনি মধ্যবিত্ত সমাজকে নিবিড়ভাবে কাছে পেয়েছেন। ইংরেজ আমলে নগর জীবনকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে বৃত্তি নির্ভর এক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল সমাজ বিশ্লেষণের দিক থেকে এইবৃত্তি নির্ভর শ্রেণীকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলা হয়। বৃত্তি ও মানসিকতার দিক থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল নগর নির্ভর। উকিল, ডাক্তার, কেরাণী, অফিস পরিচালক, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, শিক্ষক, দালাল, ঠিকাদার প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীদের দ্বারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। অর্থনৈতিক মানদন্ড হিসেবে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিশেষভাবে সচ্ছল। প্রমথনাথ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিকতা সম্পর্কে ছিলেন বিশেষ সচেতন। মধ্যবিত্তের উদ্ভবের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সম্পর্ক নিরূপণ করতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন —

" সমাজবদ্ধ মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মপ্রকাশের সহজাত বাহন গদ্য সাহিত্য। পদ্য নিঃসঙ্গ মানুষের ভাষা . . . । কিন্তু গদ্যের এভাবে চলবার উপায় নাই। তার পরিবেশের জন্য চাই একটি বৃহৎ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়।"

তিনি এরপর বাঙালী মধ্যবিত্তের উদ্ভব সম্বন্ধে বলেছেন,

" . . . মধ্যবিত্ত সমাজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনতন্ত্রের পরিণাম আর সেই জন্যই এর গোড়াপত্তন হয়েছিল কলকাতা ও তৎসন্নিকটবর্তী অঞ্চলে। এই নূতন সমাজ ও নূতন সাহিত্য এক জন্মসূত্রে গ্রন্থিত।"[২৩]

১২৯১ বঙ্গাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তে র প্রতিপত্তি সম্বন্ধে উল্লসিত হয়ে লিখেছেন -

" সমাজের কর্তৃত্ব ভূমাধিকারীদের হাত হইতে এই প্রথম মধ্যবিত্ত লোকেদের হাতে গেল। অর্থাৎ কর্তৃত্ব ধনের হাত হইতে বুদ্ধি বিদ্যার হাতে গেল। এখন ইহাতে বাঙালার ধনবানের আর কেহই নহেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ই কর্তা। "[২৪]

তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী পুরোপুরি নগরজীবন ও বৃত্তিনির্ভর জীবন নয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে পরগাছা জমিদারদের তল্পিবাহক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাঙন ধরে। এই ক্ষীয়মান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকেই বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব হয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য বিচার করলে দেখা যায় এরা অভিজাত শ্রেণীর তোষণকারী এবং শোষিত, নির্যাতিত, সর্বহারা শ্রেণীর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করত।

কথাসাহিত্য নগরজীবন ও পল্লীজীবনের আলেখ্য। অথচ নাগরিক জীবনের উদ্ভবের কাল থেকে নগরজীবন ছিল অতিশয় জটিল। নগরজীবনের সঙ্গে পাপপুণ্য, ভালমন্দ, সুন্দর, কুৎসিত মিশে আছে। যুগযন্ত্রণার চাপে নাগরিক জীবনে গরল ও অমৃত দুটোই উঠে এসেছে। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার প্রভাবে নগরজীবনে পুঞ্জীভূত হয়েছে ক্লেদ গ্লানি বিলাসিতা ও হাহাকার। একদিকে আড়ম্বর ভোগৈশ্বর্য অন্যদিকে দুঃখ দৈন্য ও শূণ্যতা। একদিকে অস্তি অন্যদিকে নাস্তি। যে শিল্পী নগর জীবনের বিষামৃত পান করেন নি কিংবা নাগরিক জীবনের জটিল অভিজ্ঞতার শরিক হন নি আর যাই হোক না কেন তিনি সমাজসচেতন দক্ষ শিল্পী নন। প্রমথনাথ নাগরিক জীবনের জটিল অভিজ্ঞতার শরিক হয়েছেন, একদিকে তিনি দেখেছেন তাঁর সমাজের নিবু নিবু প্রদীপ শিখার মতো মলিনতা, তিনি দেখেছেন কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের মূল্যবোধের অপচয়, তাদের সঙ্কীর্ণতা, কৃত্রিমতা, স্বার্থপরতা ও যান্ত্রিকতাকে, দেখেছেন অস্থির অবস্থা, সমাজের ভাঙন, একান্নবর্তী পরিবারের অবক্ষয় ও অসহায়তা।

প্রমথনাথ বীক্ষণ শক্তির দ্বারা নগর জীবনের ও ধনী উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য কতটা তা উপলব্ধি করেছেন। প্রাক্‌যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর পটভূমিকায় সমাজ জীবনের ভাবনাকে আত্মস্থ করেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে ভোগসর্বস্ব ইঙ্গবঙ্গীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের গতিবিধি প্রমথনাথের দৃষ্টি এড়ায় নি। পারিপার্শ্বিক এই পরিমন্ডল প্রমথীয় সাহিত্যের উপকরণ হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই।

জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বিশিষ্ট পারিপার্শ্বিকতার মধ্য দিয়ে প্রমথনাথ যে মানসিকতা অর্জন করেছিলেন তার মূল উপাদান ছিল ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাস।

ঐতিহ্যচেতনা, সমসাময়িকতা ও প্রগতিশীলতা এই তিনটি ধারায় সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ীর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়, যা লেখকের ভাবনার ক্ষেত্র। যে কোন লেখকের মনোজীবনের ভিত্তিভূমি হল অতীতে যা বর্তমানের পথ পেয়েই ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করে। লেখক অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে কল্পনার আলোকে যুগধর্ম অনুসারে বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়। কাজেই অতীত জ্ঞান না থাকলে বর্তমান কাল হবে উপেক্ষিত আবার বর্তমান কাল উপেক্ষিত হলে ভবিষ্যৎ অদ্ভুত আঁধারের দিকে যেতে বাধ্য। এজন্য ডঃ নারায়ণ চৌধুরী বলেছেন ঃ

''লেখকের স্থিতি বর্তমানে, তার সঞ্চয় অতীতের গর্ভ থেকে আহৃত এবং তার কল্পনা ভবিষ্যতে প্রসারিত।'' [২৫]

অতীত ঐতিহ্য ও ইতিহাস সমধর্মী। ইতিহাস সচেতক প্রমথনাথের মনোভূমি গড়ে উঠেছিল ঐতিহ্যপ্রীতি দিয়ে, তবে অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও বর্তমানকে উপেক্ষা করেন নি প্রমথনাথ। কেননা অতীত ঐতিহ্যের অনুশীলন স্রষ্টার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

আবার ঐতিহ্য কেবল ভাবগত নয় ভাষাগতও। অতীত প্রীতি বর্তমানের উপর নির্ভরশীল কেননা বর্তমানকে বাদ দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি অসম্ভব।

প্রমথনাথ খুব ধনী জমিদার বংশের সন্তান হয়তো নন তবে প্রতিপত্তিশালী জমিদার বংশের ঐতিহ্যে লালিত হয়েছেন সন্দেহ নেই। এজন্য জমিদারি ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর ছিল মুগ্ধ দৃষ্টি। ইতিহাসের রথচক্রে অস্তাচলগামী অতীত ঐতিহ্যের অনিবার্য পরাজয় তিনি দেখেছেন তাদের বিষাদকরুণ মুখচ্ছবি দেখেছেন, যদিও মনে প্রাণে ঐতিহ্যকে স্বাগত জানাতে চেয়েছেন কিন্তু ঐতিহাসিক ধারাতো পরিবর্তিত হবেই সেখানে জন্ম নেবে নতুন সমাজ নতুন ভাবাদর্শ। জমিদার শ্রেণীর প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল সন্দেহ নেই জমিদারী ঐশ্বর্য, তাদের শৌর্য, বীরত্ব প্রমথনাথের মনে মোহ সঞ্চার করেছিল ঠিকই তবুও নতুন কালের জয়ধ্বনি করতে ভোলেন নি। প্রমথনাথ কয়েক শতাব্দীর ঐতিহাসিক ধারা তাঁর সাহিত্যে রূপ দিতে চেয়েছেন। প্রমথনাথের মানসিকতায় এই ঐতিহ্যপ্রীতি থাকলেও বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে অস্বীকার করেন নি। এই ঐতিহ্য প্রীতি থেকেই গড়ে উঠেছিল তাঁর বিশিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ ও সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা।

সাহিত্যসৃষ্টির প্রেক্ষাপট হিসেবে যুগজীবনের ব্যাপক প্রভাব। প্রমথনাথ এক সংঘাত মুখর যুগের শিল্পী। ১৯২৩ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য রচনার কালপর্বে জাতীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবনে এক চাঞ্চল্যকর বিপ্লবাত্মক ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়েছিল। স্বদেশের সীমানায় বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ইংরেজ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ ভারতভূমিতে আছড়ে পড়েছিল। স্বাধীনতার লক্ষ্যে অগ্নিযুগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করেছিল। অন্যদিকে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে গান্ধীজীর আবির্ভাবের

ফলে তাঁর ডাকে আসমুদ্র হিমাচল অসহযোগ আন্দোলন, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন বৃটিশের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। ইংরেজরা দমন মূলক নীতি গ্রহণের মধ্য দিয়ে রাউলাট অ্যাকট, কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা ইত্যাদি কুখ্যাত আইন বিধিবদ্ধ হল। এর মধ্য দিয়ে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন এক অগ্নিগর্ভ অবস্থায় দিন কাটছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে বেকারী, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, কুটির শিল্প ধ্বংস ইত্যাদি অর্থনৈতিক দুরবস্থা চরম আকার ধারণ করেছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া আরো ব্যাপকতা লাভ করল - মুদ্রাস্ফীতি, কালোবাজারী, খাদ্যসমস্যা, আকাশ ছোঁয়া দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল। আবার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, শিল্পের সম্প্রসারণ ও বাসহীন স্থানে জনবসতি গড়ে উঠল। জাপানী বোমা, আতঙ্ক, শহর ছেড়ে গ্রামে পালাবার প্রবণতা, ১৯৪৩ এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বঙ্গদেশে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। যুদ্ধশেষে নৌবিদ্রোহ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, শ্রমিক ধর্মঘট ভারতের স্বাধীনতার পথকে ত্বরান্বিত করে দিল। ফলে দ্বিজাতিতত্ত্বের মাধ্যমে ভারত ভাগ মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, এর পর ১৯৪৭ এ ভারতের স্বাধীনতা লাভ এর পর স্বাধীনতা পরবর্তীকালে উদ্বাস্তু সমস্যা, কংগ্রেসী শাসনে পাশাপাশি সাম্যবাদী আন্দোলন, ভারত চীন সংঘর্ষ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া ভারতে বিস্তার লাভ করেছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উপর এত প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। মার্কসবাদী আদর্শে সাম্যবাদী ভাবধারা রাজনৈতিক জীবনে প্রভাবিত করেছিল।

ইউরোপীয় কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের স্পর্শে এসে লেখকদের চিন্তাজগতে নতুনত্বের

সন্ধান এনে দিল। হামসুন, লেগারলফ, বিয়ার্ণসন নিম্নকোটির মানুষদের নিয়ে সাহিত্য লিখলেন। রাশিয়ার ম্যাক্সিম গোর্কি, আইভান বুনিন, আমেরিকার পার্লবাক, নরওয়ের বোয়ান বোয়ার এবং পোলান্ড, সুইডেন, চীন দেশের সাহিত্যিকরা মৎসজীবী, তাঁতী প্রভৃতি নিম্নস্তরের মানুষদের নিয়ে সাহিত্য রচনা করলেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আন্তর্জাতিক লেখকগোষ্ঠীর সাহিতের সঙ্গে বঙ্গদেশের সাহিত্যিকদের যোগাযোগ ও সাহিত্যের প্রভাব প্রতিফলিত হল।

এই সময় ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনতত্ত্বের বিশেষ করে 'On Dreams', 'The psychology of Everyday life' গ্রন্থ হেভলক, এলিসের ' Studies in the psychology of Sex' প্রভৃতি গ্রন্থ বর্ণিত যৌনচেতনা সাহিত্যে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করল। এই যুগ পরিবেশের কথা বলতে গিয়ে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন —

" কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের মাধ্যমে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বিশেষ আমদানি হ্যাভলক, এলিস, ক্রাফট, এবিং প্রভৃতি পন্ডিতের যৌন মনস্তাত্ত্বিক গ্রন্থপঠিত হইতে লাগিল। একদিকে জীবনের জটিলতা বাড়িতেছে। নিম্নমধ্যবিত্তের আর্থিক অবস্থার ক্রমাবনতির সঙ্গে তাহার সামাজিক জীবন সঙ্কট উপস্থিত এবং পারিবারিক জীবনেও ফাটল ধরিতেছে। শিক্ষার এখন নানাদিকে পলায়নী মনোবৃত্তির ঝোঁক। এখন কবিভাবনার বসন্ত প্রকৃতির কল্পনা ছাড়িয়া পাশের গলির সাধারণ মানুষের দুঃখসুখের প্রতি ধাবিত। জীবনের আদর্শের স্থানে দেখা দিতে লাগিল সাধারণ লোকের নিতান্ত সাধারণ কামনা।"[২৬]

প্রমথনাথ এই কন্টিনেন্টাল সাহিত্যদ্বারা প্রভাবিত। তিনি কবিতার আকারে লিখলেন ঃ

" কে লেখে অমর কাব্য আয়ু চিরকাল
না লিখিয়া উপন্যাস কন্টিনেন্টাল।"

এই পটভূমিকায় যে কয়টি সাহিত্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ

(ক) প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র গোষ্ঠী।

(খ) ভারতী গোষ্ঠী।

(গ) দীনেশরঞ্জন দাসের কল্লোল গোষ্ঠী।

প্রমথনাথের সাহিত্য সৃষ্টির পারিপার্শ্বিকতায় পূর্বোক্ত পত্রিকাগোষ্ঠী সমকালীনতার দাবী রাখে।

সমরেশ মজুমদার বলেছেন -

"বাংলা সাহিত্যে কল্লোলযুগ বিভিন্ন দিক থেকে উল্লেখযোগ্য কাল। পুরাতন বোধের ধারা পরিবর্তন করে আধুনিকতার পত্তনে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। সাহিত্যের কূপমন্ডূকতার অভিযোগ খন্ডন করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাংলা সাহিত্যের আসরে অবর্তীণ হয়েছিলেন।"[২৭]

প্রমথনাথ বিশী আধুনিকতা প্রবন্ধে লিখেছেন -

"কাজেই সবটা মিলিয়া দাঁড়াইয়াছে এই যে, মানুষ মনে মনে আবার যাযাবর হইয়া পড়িয়াছে।"

কল্লোলের প্রধান লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং বুদ্ধদেব বসু। এছাড়া জগদীশ গুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, যুবনাশ্ব, দীনেশরঞ্জন দাস, গোকুল নাগ, নজরুল ইসলাম, শৈলজান ন্দ, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ লেখক কল্লোলকে সমৃদ্ধ করেছেন।

রবীন্দ্রবিদ্রোহ দিয়েই কল্লোলের সূত্রপাত। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কবিতায় লিখেছেন

"সম্মুখে পথ রুধি বসি আছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যতা থাকলেও কল্লোলযুগের প্রবণতাগুলো মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ ঃ-

(১) প্রগতিমূলক ও বিদ্রোহাত্মক ভাবধারা।

(২) বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য রচনার প্রয়াস।

(৩) আবেগধর্মিতা।

(৪) বোহেমিয়নিজিম বা যাযাবরী মনোভাব।

(৫) রোমান্টিসিজিমের মোহ। যদিও বাস্তব সাহিত্য রচনার আকাঙ্ক্ষাই রোমান্টিকতার সুর।

(৬) নায়করা সাধারণ স্তরের মানুষ ।

(৭) মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব প্রাধান্য।

(৮) নাগরিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ।

(৯) গ্রাম্যজীবনের চিত্র ।

(১০) ঘটনাবিরলতা।

(১১) কাব্যধর্মীভাষা।

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত 'কল্লোল' পত্রিকায় লিখেছেন —

'' এরই নাম কল্লোল, এরই নাম আনন্দধারা, এরই নাম আর্তনাদ, এরই নাম বিদ্রোহ, এরই নাম শান্তির কামনা, প্রেমের সন্ধানে যাত্রা। '' [২৮]

নজরুলের উপন্যাসের বোহেমিয়নিজম, অচিন্ত্যকুমারের বোহেমিয়নিজমের সঙ্গে প্রবল মিথুনাসক্তি, বুদ্ধদেবের নাগরিক জীবনের প্রেম, প্রবোধকুমারের যাযাবরী বৃত্তি, মণীশ ঘটকের

বিকৃত জীবনের চিত্রাঙ্কন, এছাড়া শৈলজানন্দ, জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্রে মিত্র সেই সঙ্গে কল্লোল বহির্ভূত তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতিভূষণ, অন্নদাশঙ্কর, সুবোধ ঘোষ, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রমথনাথের সমসাময়িক লেখক।

'শনিবারের চিঠি'র আশ্রয়ে ঔপন্যাসিক হিসেবে দেখা দিলেন - তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, শরদিন্দু, বনফুল, প্রমথনাথ বিশী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

''ভারতবষে দেখা দিলেন আশাপূর্ণা দেবী, শরদিন্দু ও গজেন্দ্রকুমার মিত্র।''[২৯]

প্রমথনাথ বিশী যে সব পত্র পত্রিকায় নিয়মিত লেখক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন সেগুলি হল - 'প্রবাসী', 'শনিবারের চিঠি', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'শান্তিনিকেতন', 'দেশ', 'অমৃত পত্রিকা' ও 'কথাসাহিত্য পত্রিকা'।

প্রমথনাথের 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসটি সাহিত্যসেবার উল্লেখযোগ্য স্বীকৃত লাভ ঘটেছে ১৩৬৬ খৃষ্টাব্দে। ব্যক্তিজীবনে এই তারিখটি বিশেষভাবে স্মরণীয়কাল হিসেবে চিহ্নিত, এই সালেই উক্ত উপন্যাস লিখে তিনি 'রবীন্দ্র পুরস্কারে' সম্মানিত হন। এছাড়া ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে 'পদ্মশ্রী' উপাধি প্রাপ্ত হন।

প্রমথনাথ জাতশিল্পী বহুস্তর অতিক্রম করে সমকালীন দেশ ও সমাজের নানা স্থানে ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে শিল্পীর মর্যাদা লাভ করেছেন। তাঁর সাহিত্য খ্যাতির পেছনে জীবনের মুখ্যঘটনাপুঞ্জ ও যুগজীবনের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে এতে সন্দেহ নেই।

উল্লেখপঞ্জী

১) ভূদেব চৌধুরী ঃ বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার পৃঃ সংখ্যা ৫১১

২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩দশ খন্ড পৃঃ২২

৩) প্রমথনাথ বিশী ঃ 'প্রমথনাথ বিশীর শ্রেষ্ঠ কবিতা' পৃঃ২৬

৪) শ্রী সুধীর চন্দ্র কর ও শ্রীমতি সাধনা কর ঃ 'শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ' পৃঃ১৩

৫) প্রমথনাথ বিশী ঃ 'পুরানো সেই দিনের কথা' নিবেদন অংশ

৬) শান্তিনিকেতন পত্রিকা - ১৩২৬, শ্রাবণ সংখ্যা।

৭) প্রমথনাথ বিশী ঃ রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন পৃঃ ৭৬

৮) প্রমথনাথ বিশী ঃ তদেব পৃঃ ৪৫

৯) প্রমথনাথ বিশী ঃ তদেব পৃঃ ৭১

১০) ফাল্গুন দ্বিতীয়বর্ষ / ১১শ সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' সাময়িক পত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ লেখিকা সুপ্তি মিত্র।

১১) প্রমথনাথ বিশী ঃ রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন পৃঃ ৯২

১২) প্রমথনাথ বিশী ঃ তদেব পৃঃ ২৯

১৩) রানী চন্দ, গুরুদেব, পৃঃ ৮৪

১৪) আনন্দমেলায় কবির গল্প ((প্রবন্ধ) আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয় সংখ্যা, ১৩৪৮

১৫) ডঃ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, রবীন্দ্র প্রতিভায় নিসর্গপ্রকৃতি ও শিল্পকলা।

১৬) প্রমথনাথ বিশী ঃ 'প্রমথনাথ বিশীর শ্রেষ্ঠ কবিতা' পৃঃ ১৬৫

১৭) প্রমথনাথ বিশী ঃ কাব্যগ্রন্থ 'গুরুদেব'। পৃঃ ১৭

১৮) দেবেশ চন্দ্র রায় ঃ 'রাজসাহীতে দু'বছর' প্রবন্ধ। কথাসাহিত্য ঃ শ্রী প্রমথনাথ বিশী সংবর্ধনা সংখ্যা।

১৯) দেবেশ চন্দ্র রায় ঃ তদেব।

২০) দেবেশ চন্দ্র রায় ঃ তদেব।

২১) প্রমথনাথ বিশী ঃ 'হংস মিথুন' কাব্যগ্রন্থ - 'সূর্যাস্তের পদ্মা' পৃঃ-১৮২

২২) হীরেন্দ্র নাথ দত্ত ঃ প্রবন্ধ সংকলন। পৃঃ-১৩০

২৩) প্রমথনাথ বিশী ঃ 'বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক'-(১৯৫৫)। পৃঃ - ২১-২২

২৪) বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ 'লর্ড রিপনের উৎসবের জমা খ রচ' বঙ্কিম রচনাবলী -দ্বিতীয় খন্ড। পৃঃ-৯১৯

২৫) নারায়ণ চৌধুরী ঃ 'আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন'। পৃঃ-৫২

২৬) সুকুমার সেন ঃ 'বাংলা সহিত্যের ইতিহাস' (চতুর্থ খন্ড)। পৃঃ- ২৯০

২৭) সমরেশ মজুমদার ঃ 'বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর' (১৯২৩-৪৭)। পৃঃ - ৪

২৮) অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত ঃ 'কল্লোল' - তৃতীয় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা।

২৯) কথা সাহিত্য, মাঘ - ১৪০২, ৪৭ বর্ষ। বইমেলা সংখ্যা।